নারীকে ঘিরে কুসংস্কার

আফরোজা অদিতি

অনেক দূর এগিয়ে গেছে মানবসভ্যতা। মানুষ এখন আর অসভ্য-বর্বর নয়, এই কথা মেনে নেওয়া হয়। মেনে নেওয়া হয় মানুষ সভ্য-ভব্য শিক্ষিত। কেউ বা স্বশিক্ষিত, যদিও নিরক্ষর আছে কেউ কেউ। তবু মানুষের এখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে মাসের পর মাস সময় লাগে না। প্রিয় স্বজনের কাছে কোনো খবর পৌঁছাতে টেলিগ্রাম-ট্রাংকলের কাছে ধরনা দিতে হয় না। মোবাইলে খুব সহজে যেকোনো খবর দ্রুত অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। স্কাইপিতে কথা বলার সময় স্বজনকে চোখের সামনে পাওয়া যায়। মনেই হয় না দূরের মানুষটি দূরে আছে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে আছে মানুষ। অন্যান্য দেশের মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষও তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে নেই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন যত দূরেই থাকুক না কেন, ফেসবুক, টুইটার, ইমেইলের মধ্যস্থতায় তারা এখন হাতের নাগালে। এখন এক ক্লিকেই জানতে পারা যায় সব খবর। এমনকি ঘরে বসে উপার্জনও করা যায়।

আমরা একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল বাংলাদেশের মানুষ। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, বিদেশ যাচ্ছে। তবু প্রদীপের গোড়ায় অন্ধকারের মতো এমন কিছু সংস্কার আছে, যা আমাদের পিছন থেকে টেনে রেখেছে। লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও তা মন থেকে বা জীবন থেকে তাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

সংস্কার এমন কিছু, যা মানুষের মনে বিশ্বাসের রূপ নেয়। এই বিশ্বাস কু (মন্দ) হতে পারে, আবার হতে পারে সু (ভালো)। মানব ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় মানবসভ্যতার প্রাক্কালে মানুষ যেভাবে বাস করত, তাকে মানুষের শৈশবকাল বলা যায়। শৈশবে যেমন মানুষ কোনো কিছু বুঝতে পারে না, যা মা-বাবা-গুরুজন বুঝিয়ে দেন তাই বোঝে এবং মেনে চলে; তেমনি সভ্যতার প্রাক্কালেও মানুষের মনে অনেকগুলো বিষয় দাগ কেটেছিল। কল্পিত হলেও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ফলে সেগুলো বিশ্বাসে রূপ নিয়েছে। সেগুলো যুগ যুগ ধরে চলে এলেও সত্য-মিথ্যা বিচার করার মতো শিক্ষা বা সচেতনতা না থাকায় তারা তা মেনে নিয়েছে। আজো শিক্ষাবঞ্চিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষের মনেও তা আসন গেঁড়ে বসে আছে।

কুসংস্কার কী? খুব অল্প কথায় এভাবে বলা যায় যে, সংস্কার হলো মনের বিশ্বাস; আর যে সংস্কার মানবজীবনের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই কুসংস্কার। এক কথায় বলা যায় অন্ধবিশ্বাস। কোনো কিছু বিশ্বাস করতে বাধা নেই। কিন্তু সে বিশ্বাস যদি জীবনকে পিছন থেকে টেনে রাখে বা অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে তার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আমাদের এই নাগরিক জীবনে কিছু বিশ্বাস এখনো আছে, যা চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এই সংস্কার পূর্বমানবের কাছ থেকে পাওয়া এবং উত্তরসূরিদের মাঝে পুনরায় প্রোথিত করে দেওয়ার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে; যা অগ্রতির পথে বাধাস্বরূপ। সংস্কার বা কুসংস্কার যাই বলি না কেন, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতার অভাবেই আজো এগুলো জীবনের গতির সঙ্গে চলমান।

বিশ্বাস হলো সবচেয়ে বড়ো কথা। যেটাই মানব মনের বিশ্বাস, সেটাই তার মনের সংস্কার। বেশিরভাগ সময় এই সংস্কারের মূলে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাস। কারণ বেশিরভাগ মানুষ ধর্মভীরু। ধর্মীয় বিশ্বাসকে সে ভেঙেচুরে দেখতে রাজি হয় না কখনো। যা বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানকার 'সানতা ফে' শহরে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ধর্মীয় গোষ্ঠীর গুরু অ্যাপেল হোয়াইটসহ ৩৯ জন একযোগে আত্মহত্যা করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল আকাশে দৃশ্যমান 'হেলবপ' ধূমকেতুর লেজের ভেতর লুকানো আছে একটি মহাকাশযান। ধূমকেতুটি আসার মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করলে যানটি উন্নতবিশ্বে পৌঁছে দিবে। এরা 'হেভেনস গেট' নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য।

অনেকে বলতে পারেন, যারা আত্মহত্যা করেছে তারা জীবন সম্পর্কে হতাশ ছিল। কিন্তু তাদের আত্মহত্যার সপক্ষে সেরকম কোনো যুক্তি নেই। তারা আত্মহত্যার আগে দেখেছে 'স্টার ট্রেক' আর 'এক্স ফাইল' ছবি দুটি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিয়েছে মহাজাগতিক যানের খবরাখবর। খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-ফূর্তি করেছে। এগুলো টেপ করে রেখেছে। তারা হতাশ ছিল না বরং উন্নত জীবনের সন্ধানে ভিনগ্রহে যাওয়ার উপযুক্ত সময় ও বাহন 'হেলবপ' ধূমকেতু আসার অপেক্ষায় ছিল (বিজ্ঞান চেতনা পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁ, শোলাকিয়া হত্যাকাণ্ডসহ দেশে-বিদেশে নানারকম হত্যাকাণ্ড ঘটছে ধর্মীয় বিশ্বাসনির্ভর হয়ে। মানুষের বিশ্বাস মানুষকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনেক কিছু করতে বাধ্য করে। এই বাধ্যতাই অন্ধবিশ্বাস। তাই জোরকণ্ঠেই বলতে হবে, যে বিশ্বাস মানুষকে অন্ধকারে নিয়ে যায়, অপরাধ করতে উৎসাহিত করে, ডেকে আনে ধ্বংস, বিচ্ছিন্ন করে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র থেকে, সে বিশ্বাস ধর্মসংশ্লিষ্ট হোক আর না হোক, তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বর্জনীয়।

'হেলবপ' ধূমকেতু সম্পর্কে ওই বিশ্বাস ছাড়াও অন্যান্য ধূমকেতু সম্পর্কে আরো অনেক কথা প্রচলিত আছে; যেমন আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলে অমঙ্গল হয়। মানুষের অনিষ্ট হয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে ধূমকেতু সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও উপরের ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনা অন্ধবিশ্বাস থেকেই ঘটেছে। ধূমকেতু ছাড়াও আছে উল্কাপাত। সাধারণ ভাষায় বলা হয় তারা-খসা। এই তারা-খসা নিয়ে মানুষের মধ্যে ধারণা আছে যে, এ সময়ে যা প্রার্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায়। দাদি-নানিরা বলেছেন, উল্কাপাতের সময় উল্কাপাতের কথা

বললে অমঙ্গল ঘটে। ওই সময় প্রার্থনা করতে হয়। এখনো তারা-খসার সময়ে প্রার্থনা করে অনেকেই।

কুসংস্কার শিক্ষাবঞ্চিত, অর্ধশিক্ষিত, অর্ধসভ্য ও দুর্বল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। কুসংস্কার হলো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসাধারণের মনের অন্ধবিশ্বাস, যা অযৌক্তিক, অতিপ্রাকৃত, দৈববাণী-নির্ভর, জাদুবিশ্বাস-নির্ভর, মিথ্যাবিশ্বাস-নির্ভর বা ধর্মব্যবসায়ীদের দেওয়া ধর্মের অপব্যাখ্যা। আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশ। এখানে বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষাবঞ্চিত বা অর্ধশিক্ষিত। শিক্ষাবঞ্চিতদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। নারীরা শুধু শিক্ষাবঞ্চিতই নয়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। নারীরা প্রকৃতিগতভাবে ধর্মভীরু ও মানসিকভাবে অবদমনের শিকার। তাই এ দেশের যত প্রচলিত কুসংস্কার আছে, অধিকাংশই নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এমনকি নারীদের মাধ্যমেই তা সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার অভাবে পুরুষও পরোক্ষভাবে এর শিকার হচ্ছে; যেমন ফতোয়া দেওয়া। আমাদের দেশের ধর্মব্যবসায়ীরা অনেক বিষয়েই ফতোয়া দেয়; যেমন গাছের প্রথম ফল, সবজি, মুরগি বা হাঁসের ডিম ধর্মীয় উপাসনালয় তথা মসজিদ-মন্দিরে দিতে হয়। না দিলে ফল-সবজি-ডিম ভালো হয় না। আমাদের নারীরা তা উদারমনে বিশ্বাস করে এবং প্রথম ফল, ডিম, সবজি ঘরের মানুষকে খেতে না দিয়ে মসজিদ-মন্দিরে দেয়।

আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আজো আছে হিল্লাবিয়ে প্রথা, তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক, ভূত ছাড়ানোর জন্য ঝাড়ুপ্রথা। অসুখ-বিসুখে পানিপড়া, তেল-বাতাসা পড়া তো আছেই। মা-চাচি-নানি-দাদিদের মধ্যে এমন ধারণাও আছে যে, তেলের পিঠা ভাজার সময় যদি বড়ো মেয়ের ছায়া পড়ে তাহলে সে পিঠা হয় না। আবার মেয়েদের মাসিক বা পিরিয়ড হওয়ার সময়ে আচার ছুঁয়ে দিলে সে আচারে ফাগুন্দা (ফাংগাস) পড়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে এসব বিশ্বাস টিকে থাকলেও শহরাঞ্চলে কিছুটা কমে এসেছে।

পারিবারিক আইন অনুযায়ী মুখে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যায় না। কিন্তু কিছু ধর্মব্যবসায়ী আছে, যারা ফতোয়া দেয় 'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করলেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালে প্রণীত মুসলিম পারিবারিক আইন ফতোয়াভিত্তিক বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন করে না। সঠিক বিবাহবিচ্ছেদ হতে হলে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান, মিউনিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র কিংবা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে নোটিশ করতে হবে এবং এই নোটিশ কার্যকর হতে ৯০ দিন বা তিন মাস সময় লাগে। অথচ এখনো গ্রামাঞ্চলে তালাক শব্দটি উচ্চারণ করলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটার ফতোয়া দেওয়া হয় এবং স্বামী যদি তার ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ঘরে নিতে চায়, সেটাও স্বার্থান্বেষী মহল ঘটতে দেয় না। বরং তারা হিল্লা নামে মধ্যবর্তী একটি বিয়ের ফতোয়া দেয়। অথচ হিল্লাপ্রথা আমাদের পারিবারিক আইনে নেই। ধর্মব্যবসায়ীদের সহায়তায় ধর্মের নামে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে জিইয়ে রেখে নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নির্যাতন করার হিল্লাবিয়ে প্রথা আজো আমাদের সমাজে টিকে আছে। গ্রাম্য নারীরাই শুধু নয়, পুরুষরাও এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ। তা ছাড়া, সমাজের

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে অনেক সময় পুরুষরাও এসব নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়। তবে হিল্লাবিয়ের কুফল সবেচেয়ে বেশি বর্তায় নারী ও শিশুদের ওপর।

এরকম অনেক সংস্কার আছে, যা অনেকের মনে বিশ্বাস জাগালেও কার্যত তার দ্বারা কোনো সুফল ফলে না। এমন কিছু সংস্কারের কথা এখানে বলা হলো :

এটা আমাদের দেশের খুবই চেনা দৃশ্য যে, পরীক্ষা পাসের জন্য ছেলেমেয়েদের তাবিজ-কবজ পরানো হয়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করি। আমি যখন ডিগ্রি পরীক্ষা দিব, তখন আমার ফুফুশাশুড়ি আমার পরীক্ষা পাসের জন্য একটা তাবিজ এনে গলায় পরতে দিলেন এবং যে কলম দিয়ে পরীক্ষা দিব সেই কলমটা জটওয়ালা বুড়িকে দিয়ে দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে নিলেন। আমি সংসারের কাজ সামলানো ও বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ সেরে পড়াশোনার জন্য সময় খুব একটা পেতাম না, তাই এই ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, আমি সেবার পরীক্ষায় ফেল করি। কারণ পড়ালেখা না করলে পেটে বোমা মারলেও একটা অক্ষর বের হয় না। এ অবস্থায় কি পরীক্ষায় পাস করা যায়, যতই কলমে ফুঁ দেওয়া হোক, যতই তাবিজ পরা হোক!

১৯৬৯ সালে আমাদের গ্রামে 'লালটুপি' নামে যে কৃষক সম্মেলন হয়, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সে সম্মেলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমার বাবা, কমরেড আলাউদ্দিন আহমেদ ছিলেন সে সম্মেলনের আহ্বায়ক। তখন তিনদিন মওলানা সাহেব আমাদের বাড়িতে ছিলেন। গ্রামের নারী-পুরুষ তাঁর কাছে পানি আর তেলপড়া নিতে আসতেন। মওলানা সাহেবও খুশি হয়ে দিতেন। এ বিষয়ে মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'রোগ সারে যেমন ওষুধে তেমনি বিশ্বাসে। এদের বিশ্বাস আমার দেওয়া পানি আর তেলপড়াতে অসুখ সারবে তো সেরে যাবে। আসলে সর্দিকাশি জ্বরের মতো অসুখের মেয়াদকাল থাকে, যা ওষুধ খেলেও সারে, না খেলেও সারে।' তবে বিশ্বাসের ওপরে কষ্ট কম হয়। এখানে বলে রাখি আমার দাদা স্কুলটিচার ছিলেন, সেই সঙ্গে ইমাম ছিলেন। ঝাড়-ফুঁক করতেন, তবে তিনিও মওলানা সাহেবের মতো বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন।

একটা বিশ্বাসকে বলে শনির দশায় ধরা বা শনির দৃষ্টি পড়া। গ্রামাঞ্চলে তো আছেই, শহরেও অনেকের মনে এ বিশ্বাস আছে যে, শনির দশায় ধরলে বা শনির দৃষ্টি পড়লে হাজার ভালো কাজ করলেও কখনো ভাগ্য ফেরানো যায় না। অনেকে শনির দশা কাটানোর জন্য অনেকরকম ধাতু বা পাথর পরেন আঙুলে। এতে শনির দশা কেটে যায় বলে মনে করা হয়! কিন্তু আসলে তা নয়। যখন কোনো কাজ করে কাজের ফল লাভ হয় না, তখন মনে করতে হবে যে কাজটি সঠিকভাবে করা হয় নি। কথায় আছে মানুষ ৯০ ভাগ ভাগ্য নিজের হাতে গড়তে পারে।

আর একটা বিশ্বাস আছে বাটি চালান দেওয়া, আয়না পড়া বা কুলা ঘুরানো। বাটি চালান বা কুলা ঘুরানো বা আয়না পড়া গ্রামাঞ্চলে চোর ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হোস্টেলে থাকতাম। সে সময় হোস্টেলে আমরা ১৫ জনের মতো মেয়ে ছিলাম। যে মহিলা আমাদের রান্না করে দিত, তাকে আমরা মামা বলে ডাকতাম। তো, হোস্টেল থেকে প্রায়ই খাতা-কলম-টাকা হারাত। একদিন রান্নার মামা বলল 'কুলা ঘুরান' দিতে। 'কুলা ঘুরান' কী? জানা গেল, একটা কুলার উলটো পিঠে কাপড় কাটা কাঁচি

গেঁথে সেই কাঁচির দু'পাশে দু'জন তর্জনি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে। আর অন্য একজন সেই কাঁচির ওপরে মুঠো করে আস্তে আস্তে চাল দিলে সেই কুলা ঘুরতে ঘুরতে যার দিকে গিয়ে থামবে সেই চোর সাব্যস্ত হবে। কাজটা করা হলো; কিন্তু কারও দিকে নির্দেশ না করে কুলা গোল হয়ে বসা সবার মাঝে যেখানে গিয়ে থেমে গেল, সেখানে কেউ বসে নেই। কিছুই হলো না। টাকা-খাতা-বই কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, যে বা যারা চুরি করেছিল, সে বা তারা চোর হিসেবে নাম লেখানোর ব্যাপারে সতর্ক ছিল। তাই ভয়ও পায় নি, কিছু বলেও নি। কুলা ঘুরানোতে বিশ্বাস ছিল না তার বা তাদের। অথবা সে বা তারা জানত এই কুলা দিয়ে কিছুই হবে না।

সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটল আমাদের সামনের ফ্ল্যাটে। ওই ফ্ল্যাটের মহিলা বললেন, নতুন বুয়া রাখার পরে তার কেবলই টাকা হারাচ্ছে। ফ্ল্যাটে কাজের বুয়া, উনি, ওনার স্বামী আর ছেলে ছাড়া কেউ থাকে না। প্রথমবার টাকা হারানোর পরে রান্নাঘরের মেঝেতে পেলেন। বুয়াকে এদিক ওদিক খুঁজতেও দেখলেন কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। পরেরবার দুই হাজার টাকা হারাল। বুয়াকে জিজ্ঞেস করলে আল্লা-খোদার কসম কেটে বুয়া বলেছে নেয় নি। পরদিন তিনি বুয়াকে বললেন, 'তোমার খালু আয়না পড়া দিয়েছে, সেই আয়নায় তোমার ছবি উঠেছে। টাকা নিয়ে থাকলে দিয়ে দাও, তা না হলে পুলিশের কাছে বলে দিব। পুলিশ থানায় নিয়ে যাবে, তারপর পিটাবে।' সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরেফিরে সন্ধ্যায় বুয়া ওই মহিলার কাছে টাকা দিয়ে বলে, 'আচ্ছা খালাম্মা, একটা কথা কন তো, এখানে আমি টাকা নিলাম ওখানে আয়নায় আমার ছবি ক্যামনে উঠল?'

এই ঘটনায় শিক্ষাহীন কাজের বুয়ার বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা নেই বলেই তার খালাম্মার বিবৃতিটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছে এবং পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে চুরির কথা স্বীকার করেছে। বাটি চালান দেওয়াও এরকমই। চোর হয়ত ভয়ে স্বীকার করে। কখনো আবার বাটি যাকে চোর সনাক্ত করে সে হয়ত পুরোপুরিই নির্দোষ। অন্যদিকে যাদের জিনিস হারায়, তারা ভাবে সে-ই নিয়েছে। তখন দুই পরিবারে বিবাদ লেগে যায়। এদিকে চোর ধরতে না পারলে ওঝা মানুষকে নয়-ছয় বুঝিয়ে পার পেয়ে যায়। এভাবে দুইপক্ষকেই বোকা বানায় বাটি চালানের ওঝা।

ছোটবেলা সন্ধ্যার আগেই চুল বেঁধে রাখতে হতো, না হলে ভূতে আছড় করবে। আবার সন্ধ্যায় অন্ধকারে যাওয়ার সময় 'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষণ বুকে আছে করবি আমার কী'— এই ছড়া কাটলে ভূত ধারেকাছে আসতে পারে না, এই বিশ্বাস ছিল মনে। মধ্যযুগ থেকে এই 'ভূতে পাওয়া' বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। সেই সময় নানারকম ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজের ব্যবস্থা করা হতো। ভূতে পাওয়া রোগীরা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। তারা গান গায়, নাচেও কখনো কখনো। কেউ কেউ চুপচাপ বসে থাকে। কেউ-বা আবোলতাবোল কথা বলে। ভূতে পাওয়া রোগ শিক্ষিত থেকে শিক্ষাবঞ্চিতদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তা ছাড়া বেশি দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে এবং শিশু ও বৃদ্ধ অপেক্ষা উঠতি বয়সীদের মধ্যে।

এখনো স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে 'ভূতে আছড়' করেছে বলে ওঝা ডেকে আনা হয় ও ভূত তাড়ানো বা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ভূত তাড়াতে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে

রোগীকে গন্ধ শুকানো হয় বা চামড়ার জুতা শুকানো হয়। কখনো মাথায় পানি ঢালা হয়, কখনো-বা ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করা হয়। অনেক সময় এসব ব্যবস্থায় যাকে ভূতে আছড় করেছে বলা হয়, সে মারাও যায়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ভূত-দেও-দানো বলে কোনো কিছু এ পৃথিবীতে নেই। এ সবই বুজরুকি, কল্পকাহিনি।

গ্রামে অনেক কিশোরীকেই ভূতে ধরে! শারীরিক পরিবর্তনের প্রাক্কালে অনেক মেয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো অল্প বয়সে বিয়ে দিলেও শারীরিক কষ্টের একটা ভীতি পেয়ে বসে তাদের। তা ছাড়া, এ বয়সে তারা নানা অবদমনের শিকার হয়। এসবের ফলেই ভূতে ধরা নামক সমস্যাটি দেখা দেয়। শুধু যে কিশোরী মেয়ে বা গ্রামের শিক্ষাবঞ্চিত মেয়েরাই এই অবদমনের শিকার হয় তা নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষিত মেয়েরাও নানারকম অবদমনের শিকার হয়। নারী তার নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পিতা, ভাই, স্বামী, শ্বশুর বা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবকের কাছে তা মূল্য পায় না। অনেক সময় নারীদের কাছেও নারীর ইচ্ছা অবমূল্যায়িত হয়। ফলে অবদমন আসে। অবদমিত বেশিরভাগ নারীই বিষণ্নতা ও রক্তশূন্যতায় ভোগে। অনেকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের জন্য ওঝা নয়, বরং প্রয়োজন যথাযথ কাউন্সেলিং ও চিকিৎসকের পরামর্শ।

গ্রামাঞ্চলে এখনো জিনে ধরার ঘটনা ঘটে। আমার এক আত্মীয়, কথিত ছিল তাকে জিনে ধরেছে। নিজে দেখেছি তাকে অন্যরকম কণ্ঠস্বরে কথা বলতে। মাঝেমধ্যে সেই কণ্ঠে আমার সঙ্গে কথাও বলত। আমি বিশ্বাস করে অনেক কথা তাকে, মানে সেই জিন বাবাকে বলতাম। আমার সেই আত্মীয় একদিন শূন্যে হাত বাড়াল, তারপরে মুঠো পাকিয়ে আমার সামনে হাত খুলল। সেখানে শেকড়ের মতো কিছু ছিল। আমাকে বলল সেগুলো রেখে দিতে এবং জানাল যে, রাখলে ভালো হবে। দিলাম রেখে। আমি ওর কথা শুনতে ও ওর সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম। কী জানি! আমার আম্মা মনে হয় বুঝেছিলেন যে, আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। তাই তিনি আর ওই আত্মীয়ের সঙ্গে আমাকে মিশতে দেন নি। ওই আত্মীয় চিকিৎসা করাত না, খেত না। পরে অল্প বয়সে মারাও যায়। আমি এর সত্য-মিথ্যা নিয়ে মাঝেমধ্যে দোটানায় পড়ি এখনো।

আত্মা হাজির করার বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেরই জানা আছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। একসময় আমিও আত্মা হাজির করেছি। তার সঙ্গে কথা বলেছি। আত্মা হাজির করার মিডিয়াম হয়েছে আমার সঙ্গের আরেকজন মেয়ে। উইজা বোর্ড বানিয়ে দশ পয়সার ওপরে (তখন দশ পয়সা ছিল) আঙুল রেখে কোনো একজন ভালো আত্মাকে ডাকতাম। ঘর থাকত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর মোমের আলো জ্বালানো। পয়সা চলচল করে চলত এবং Yes অথবা No-তে গিয়ে থামত। নাম জিজ্ঞেস করলে উইজা বোর্ডের চারপাশের A-B-C-D লেখার ওপরে ঘুরে ঘুরে একটা নাম বলত। সত্যিকার অর্থে আত্মা হাজির হয় কি না জানি না, তবে এখন মনে হয় দু'জনের আঙুল পয়সার ওপরে রাখলে কোনো বিশেষ প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ায় ওই পয়সা চলত। আর প্রশ্নের উত্তর মন যা চাইত তাই হতো। কোনো সময় প্রশ্নের উত্তর 'না' হতো, কখনো-বা 'হ্যাঁ', যা মেনে নিতে

হতো। মনে পড়ে, আত্মা হাজির করার পরে খুবই ভয় পেয়েছিলাম। পরে ভয় পেতাম 'না' উত্তরের কাজগুলো করতেও। এর পরে আর আত্মা হাজির করি নি।

বিয়ের পরে প্রথম বউ ঘরে এলে পিড়ির ওপরে তাকে দাঁড় করিয়ে নিচে পানি ঢেলে দেওয়া হতো। এই বউ সংসারের উন্নতি আনবে। বিয়ের পরদিন বউকে মিষ্টি রান্না করতে দেওয়া হতো, তাতে নাকি বউয়ের ব্যবহার মিষ্টি হবে। এখন অবশ্য টিভি সিরিয়ালের কল্যাণে অনেক কিছুই করে বাংলাদেশের মানুষ।

নারী মা, নারী বোন, নারী দাদি-নানি বা অন্যান্য আত্মীয়। নারী যখন প্রথম মা হয়, তখন তার দেখভাল স্বামী থেকে স্বামীর গুরুজনেরাই (মা-দাদি) বেশি করে থাকেন। কোনো মেয়ের গর্ভাবস্থায় যদি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তবে সেই গর্ভবতী নারীকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এটা সম্ভব না হলে একটা সোজা লাঠি বা পাটকাঠি দাঁড় করিয়ে গর্ভবতী নারীকে বিছানায় চিত করে টানটান শুইয়ে রাখা হয়। কখনো কোনো কিছু কাটাকুটি করতে দেওয়া হয় না। ১৯৮০ সালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। তখন এমন ঘটনা এই ঢাকা শহরেই এক বাড়িতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি যে, সোজা না থাকলে নাকি সন্তান যেকোনো শারীরিক অসংগতি নিয়ে জন্মাবে।

ছেলে জন্মালে করা হয় ছয়দিনের একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ছেলের মাথার কাছে কুলায় খাতা, কলম, ধান, ফল ও ধর্মগ্রন্থ রাখা হয়। এতে ছেলে বিদ্বান ও ভাগ্যবান হয়। কিন্তু মেয়ে হলে এটা করা হয় না। কারণ মেয়ের অত বিদ্বান হতে নেই! মেয়ে বিদ্বান হলে সংসারে অশান্তি আসে!

এই প্রসঙ্গে শোনা একটি গল্পের কথা মনে পড়ল। 'এক ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েছে। ছয়দিনের রাত। বিধাতাপুরুষ আসবেন ভাগ্য লিখতে। বিধাতাপুরুষ এসে ঘরে ঢুকলেন যখন, তখন ব্রাহ্মণ ঘরের দরজায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লেন। বিধাতাপুরুষ কাজ শেষ করে বের হবেন, কিন্তু বের হতে পারছেন না। মানুষ ডিঙিয়ে বের হতে পারেন না তিনি। ব্রাহ্মণ না সরলে তিনি বেরোতে পারছেন না। সরতে বললে ব্রাহ্মণ বললেন, ছেলের কপালে কী লেখা হয়েছে? বিধাতাপুরুষ বললেন, এটা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণ নাছোড়; না বললে তিনিও দরজা ছাড়বেন না। এদিকে সকাল হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে বিধাতাপুরুষ বললেন, একটা গরু আর এক বস্তা ধান। পরদিন বিধাতাপুরুষ রাতে একটা গরু আর এক বস্তা ধান দিয়ে গেলেন। সকালবেলা ব্রাহ্মণ তা বেচে দিলেন। এভাবে বিধাতাপুরুষ রোজ একটা করে গরু ও এক বস্তা ধান দিয়ে যান, আর ব্রাহ্মণ তা বেচে বহাল তবিয়তে থাকেন।' এটা নিছক গল্প। তবে গল্প হলেও এতে বিশ্বাসের বার্তা আছে। আর তা হলো : ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। এটাই মানুষের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আজো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। ভাগ্যে থাকা এক বস্তা ধান আর একটা গরু তো বিধাতাপুরুষকে দিতেই হবে!

কুকুর যদি গভীর রাতে কিংবা দিনের বেলা কাঁদে তাহলে দেশ বা দেশের মানুষের অকল্যাণ হয় বলে বিশ্বাস করে অনেকে। আবার কাক যদি তার স্বাভাবিক ডাকের চেয়ে একটু অন্যরকমভাবে ডাকে, তাহলে অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে। শুধু তাই নয়, কাক কোনদিক মানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ দিকে মুখ করে ডাকল, তা দেখতে-

বুঝতে ও কাকের ডাকের অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত হয় অনেকে। অনেকেই মনে করে, কাকের ডাকের স্বরভিন্নতায় কোনো আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সংবাদ বা অন্য কোনো অকল্যাণ নিহিত আছে। কোনো আত্মীয় মারা গেল নাকি অন্য কোনো অকল্যাণ হতে যাচ্ছে— এই উদ্বেগে মন বিষণ্ন হয়ে থাকে।

না, কাক এবং কুকুরের ডাকের মধ্যে কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গলের আভাস নেই। রাতে কুকুরের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অন্যদিকে কাকের ডাক কর্কশ। খুবই শ্রুতিকটু। পশুপাখিরও শরীর। এরাও মানুষের মতো জন্মলাভ করে। খায়দায়, ডাকে। বংশবৃদ্ধি করে। এদের শরীরের ভিতরেও হাড় আছে, আছে পাকস্থলি, হৃদপিণ্ডসহ নানা শিরা-উপশিরা। এদের শরীরের কোনো জায়গায় যদি কোনো অসুবিধা হয়, তবে এরা নানা স্বরে নানা সময়ই ডাকতে পারে। এদের চোখ দিয়েও অশ্রু গড়ায়। খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, জবাই করার সময় পশুর চোখ দিয়েও জল গড়ায়। কোরবানির আগে গরু বা ছাগলের ডাকের পরিবর্তন হয়। ওরা কথা বলতে পারে না, তবে বুঝতে পারে। তাই ওরা কাঁদে আর বিষণ্ন কণ্ঠে ডাকে।

টিকটিকির ডাকেও অনেকের বিশ্বাস আছে। টিকটিকি যদি পূর্বদিক থেকে ডাকে তাহলে শুভ সংবাদ পাওয়া যায়। আর পশ্চিমদিকের ডাক খারাপ। উত্তর ও দক্ষিণদিক থেকে ডাকলে ভালো। এ ছাড়াও, অনেকের বিশ্বাস আছে টিকটিকি যদি মাথার ওপর পড়ে এবং বামদিক দিয়ে লাফিয়ে যায় তবে সে রাষ্ট্রপ্রধান হয়। পিঠের ওপর পড়ার পর বামদিক দিয়ে গেলে দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ বরেণ্য ব্যক্তি হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, টিকটিকির বাস মাথার ওপরে, আর মানুষের বাস নিচে। মানুষ চলার সময় টিকটিকি তার মাথায় পড়তেই পারে। টিকটিকির ডানে, বামে বা মাথায় পড়ায় কোনোভাবেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে না।

টিকটিকি নিয়ে আরো কথার প্রচলন আছে। কয়েকজন মিলে কথা বলার সময় টিকটিকি ডাকলে অনেকের ধারণা টিকটিকি 'ঠিক ঠিক' বলছে। সেকথা সত্য হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। সবারই জানা কথা যে, টিকটিকি সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী। তার বাংলা, ইংরেজি কিংবা অন্য কোনো ভাষা জানা নেই। কাজেই মানুষের কথা শুনে তার 'ঠিক ঠিক' বলার কোনো কারণ নেই। এটা টিকটিকির ডাক, একটা ধ্বনি মাত্র। এ বাবদে আরো একটা কথার প্রচলন আছে। বিদুষী খনা যখন তাঁর নামকরা জ্যোতিষী শ্বশুরের চেয়ে গণনায় বেশি পারদর্শী হয়ে উঠছিলেন, তখন শ্বশুর বরাহ খনার জিহ্বা কেটে ফেলে দিলে টিকটিকি তা খেয়ে ফেলে। এজন্য টিকটিকি 'ঠিক ঠিক' বলে। আসলে ওই 'ঠিক ঠিক' নাকি বিদুষী খনাই বলে।

আরো একটা বিশ্বাস আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এটা নিচের ইংরেজি ছড়ার বাংলা রূপ :

One for sorrow
Two for joy
Three for letter
Four for toy
Five for silver

Six for gold
Seven for secret
Never to be told—

এটা ইংরেজি কাউন্টিং বিষয়ক একটি ছড়া। এই ছড়া বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে অনেকের মনে হাসি-খুশি, সুখ-দুঃখ বিষয়ক এক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। নিচে এর বাংলারূপ দেওয়া হলো :

এক শালিকে দুঃখ হবে
দুই শালিকে সুখ
তিন শালিকে চিঠি পাবে
চার শালিকে খেলনা
পাঁচ শালিকে পাবে রূপা
ছয় শালিকে সোনা
সাত শালিক গোপন কথা
কাউকে বলো না—

অনেকের মনে এই শালিক দেখার প্রচলিত সংস্কার বা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে। এক শালিক দেখলে অনেকের মন ভারাক্রান্ত হয়, আবার দুই শালিক দেখলে আনন্দে উদ্বেল হয়। তিনটে দেখলে চিঠির অপেক্ষা করে; এখন অবশ্য চিঠি নয় ফোন কিংবা এসএমএস-এর জন্য মনটা ছটফট করে। ওপরের ওই ইংরেজি ছড়াটা বাংলা ১-এ চন্দ্র, ২-এ পক্ষ, ৩-এ নেত্র-এর অনুরূপ গুনতে শেখার ছড়া। কিন্তু কখন কীভাবে ইংরেজি কাউন্টিং ছড়া বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙালির মনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নির্ভর বিশ্বাসের ভার নিয়েছে তা বলা মুশকিল। এ নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তা করি না, নির্বিচারে শুধু বিশ্বাস করি।

আমাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস আছে; যেমন নজর লাগা। বিশেষ করে শিশু ও বিয়ের কনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস বেশি দেখা যায়। আবার খাওয়ার সময় কেউ তাকিয়ে থাকলে বলি পেট খারাপ হবে। কেউ তাকিয়ে থাকলে বা সুন্দর বললে কারো অসুখ হবে কিংবা পেটের পীড়া হবে এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আবার কোনো বন্ধ্যা নারীকে কোনো নবজাতক কোলে নিতে দেওয়া হয় না। গ্রামেগঞ্জে এখনো এসবের প্রচলন আছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়, কোনো অশুভ নজর দেওয়া যায় না। প্রচলিত আছে যে, কেউ 'নজর' দিলে অর্থাৎ কেউ যদি বলে 'সুন্দর', তাহলে তিনবার থু থু থু বলে থুথু ছিটালে ওই নজর লাগে না। জীবনপ্রবাহের সঙ্গে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে আমাদের দেশে এসব সুসংস্কার-কুসংস্কার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

মানুষের মনে গেঁথে থাকা আরো কিছু সংস্কার এখানে তুলে ধরা হলো :

১. সকালবেলা ঘর ঝাড়ু না দিয়ে টাকা-পয়সার লেনদেন করা ঠিক নয়, এতে সংসারে অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।

২. টাকা সযত্নে গুছিয়ে রাখতে হয়, তা না হলে হাতে টাকা থাকে না।

৩. কোথাও যাওয়ার সময় পিছু ডাকতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। তবে মা ডাকলে মঙ্গল হয়।

৪. অনেকে শনিবারে কোনো কাজ করে না। কারণ শনিবারে কাজ করলে শনির দশায় পায়। কেউ কেউ রাশিচক্র দেখে বার, রং ও পাথর ব্যবহার করে।

৫. মুরগির কলিজা ছেলেদের খেতে নেই। খেলে তারা সাহসী হয় না। ছেলেদের গরু ও খাসির কলিজা খেতে হয়। আবার মাছের কলিজা সাধারণত ফেলেই দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, এটা খেলে মুখে মেছতা পড়ে।

৬. জন্ম মাসে বিয়ে হতে নেই। হলে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।

৭. চৈত্রমাসে নতুন বউয়ের পা দেখতে নেই। তাই এ মাসে ছেলের বিয়ে দিলেও নতুন বউ থাকে বাপের বাড়ি।

৮. ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে, বাঁ হাতের তালু চুলকালে টাকা খরচ হয়।

৯. বাঁ চোখের পাতা লাফালে কোনো দুঃসংবাদ আসে, ডান চোখের পাতা লাফালে সুসংবাদ।

১০. বাঁ হাতের বাজুর মাংসপেশি লাফালে প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

১১. এক চোখ চুলকালে অন্য চোখও চুলকাতে হয়।

১২. পায়ে তিল থাকলে ভ্রমণবিলাসী আর ঘাড়ে তিল থাকলে অপঘাতে মৃত্যু হয়। পেটে তিল থাকলে পেটুক আর হাতের তালুতে তিল থাকলে অর্থভাগ্য ভালো। হাতের পিঠে তিল থাকলে লেখক হয় (এ লেখক মুদির দোকানের খাতা লেখক হতে পারে, হতে পারে উকিলের মুহুরি বা দলিল লেখক)।

১৩. ছেলেদের মাথায় দুটো টিক্কি (মাথার ওপরে পাক খাওয়া চুল) থাকলে দুইবার বিয়ে হয়।

১৪. ছেলে জন্মানোর সময় বামুন পৈতা (গর্ভফুলের নাড়ি কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে থাকা) থাকলে সে ছেলে বুদ্ধিমান হয়।

১৫. পাতিলের প্রথম ভাত নারীদের (মেয়েশিশুসহ) খেতে নেই, তাহলে সংসারের অনটন যায় না। এখন মেয়েরা আগে খেলেও সেই সংস্কারেই পাতিলের প্রথম ভাত তুলে রেখে খেতে দেওয়া হয়। ছেলে না থাকলে অল্প ভাত তুলে রাখা হয় বা পাখির জন্য ছিটিয়ে দেয়া হয়।

১৬. মুরগির রান ছেলেকে দেওয়া হয়। এর ব্যাখ্যা হলো ভবিষ্যতে ছেলেকে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে।

১৭. প্রবাদ-প্রবচনে নারীকে ঘিরে অনেক সংস্কার আছে; যেমন, 'মেয়ের নাম রামবালা, খায়-দায় আর বান্দে ছালা'। অর্থাৎ মেয়ে খায় আবার নিয়েও যায়। 'মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি যমে নিলেও গেলি'। অর্থাৎ মেয়ে কখনো কাছে থাকে না। মেয়ের জন্য শুধু খরচই বাড়ে। পড়ন্ত বেলায় বাবা-মায়ের কোনো কাজে আসে না মেয়ে, এই বিশ্বাস এখনো পুরুষশাসিত সমাজে প্রচলিত। এজন্য মেয়েসন্তানের জন্ম হলে অনেকের মনে কষ্ট থাকে। এই কষ্টের আরেকটা কারণ যৌতুকপ্রথা, যেটা ভিন্ন আঙ্গিকে এখনো প্রচলিত আছে।

১৮. আজান দিলে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু এই দায় কেবল নারীদেরই নিতে হয়। এজন্য আজান শুনলে মেয়েরা তড়িঘড়ি মাথায় কাপড় দেয়।

১৯. ধর্মীয় বিশ্বাস আছে যে, ভালো কাজ করলে মৃত্যুর পরে পুরুষ ৭০ জন হুর পাবে। কিন্তু নারী হলো নরকের দরজা।

২০. জন্ডিস হলে হুজুরের কাছ থেকে সুতা ও একপ্রকার শেকড়ের তৈরি মালা গলায় পরে অনেকে। কথিত আছে এই মালা বড়ো হলেই জন্ডিস সেরে যায়। জণ্ডিস হলো লিভারের গণ্ডগোলের ফল। বিশ্রাম নিলে, প্রচুর পানি, গ্লুকোজ বা চিনির সরবত খেলে এই রোগ সেরে যায়। শেকড়ে সারে না।

২১. 'আনলাকি থারটিন' বলে একটা কথার খুব চল আছে সমাজে। অনেকেই মনের অজান্তে তেরোকে পরিহার করে চলেন। আনলাকি থারটিন সম্পর্কে বাইবেলে কাহিনি বর্ণিত আছে। এই কাহিনি লাস্ট সাপার বা নৈশভোজ নামে খ্যাত। যিশুখ্রিষ্ট তাঁর ১২ জন শিষ্য নিয়ে এক ভোজসভায় ছিলেন। সেই ভোজসভাতেই তিনি নিহত হন। সেই থেকে তাঁর শিষ্যরা তেরো সংখ্যাকে অকল্যাণ ও বিপদের প্রতীক হিসেবে বিশ্বাস করে। সেই থেকে যুগ যুগ ধরে এই অশুভ তেরো মানবমনে গেঁথে আছে।

২২. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ডিম ও কলা খেতে নেই। তাতে পরীক্ষা খারাপ হয়। অথচ ডিম ও কলা না খেতে দিলেই বরং হিতে বিপরীত হবে। কারণ শরীর দুর্বল হবে। পুষ্টির জন্য এগুলো খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আর পরীক্ষার সময় তো অবশ্যই খেতে দিতে হবে।

২৩. শেষ রাতের স্বপ্ন সত্যি হয়।

২৪. বিড়াল অজু করলে (জিভ দিয়ে বিড়ালের পা চাটাকে অজু বলে) মেহমান আসে। চুল আঁচড়ানোর সময় হাত থেকে চিরুনি পড়লেও মেহমান আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২৫. চটে যাওয়া কাপ বা কোনা ভাঙা প্লেট-গ্লাসে খেলে যে খায় তার অকল্যাণ হয়। ভাগ্য ভালো হয় না।

২৬. খাবার সময় পরিচিত কেউ মনে করলে খেতে খেতে বিষম লাগে। দাঁড়িয়ে পানি খেতে নেই (বিশেষ করে মেয়েদের)। পানি খেতে হলে ডান হাতে খেতে হয়। দাঁড়িয়ে পানি না খাওয়ার অবশ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। পেটে বেশি চাপ পড়ে, বসে খেলে সেই চাপ কম পড়ে।

২৭. যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয়। খাবার বেশি খেলে সন্তান প্রসবে অসুবিধা হয়। এই বিশ্বাসে গ্রামাঞ্চলে অনেক গর্ভবতীকে কম করে খেতে দেওয়া হয়। এতে অপুষ্টির কারণে প্রসবের সময় প্রসূতির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

২৮. স্বাভাবিকভাবে বিধবাদের বিয়ের হলুদ ছুঁতে দেওয়া হয় না।

২৯. ডিমপড়া, কলাপড়া খেলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। পিরের কাছে ধরনা দিলে সন্তান হয়।

৩০. আছরের আজানের পরে বই পড়তে নেই। এতে বিদ্যা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। আমার মতে, বিদ্যা চলে যায় কি না জানা নেই, তবে স্বল্প আলোয় পড়ার জন্য চোখের ক্ষতি হয়।

৩১. সোমবার ও শুক্রবারে নতুন কাপড় পরতে নেই। সংসারের অকল্যাণ হয়।

৩২. মঙ্গল ও বুধবারে নতুন হাঁড়ি চুলায় দিতে নেই। এত মেয়ে বা বউ বিধবা হয়।

মানুষের মনে কোনো না কোনো বিশ্বাস থাকবেই। এই বিশ্বাসই সংস্কার। কিন্তু এই সংস্কার যদি মানুষের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য তৈরি করে, মানুষের সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি করে, ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে কিংবা ধ্বংস ডেকে আনে, তাহলে সেটা কুসংস্কার। বলে রাখা ভালো যে, এসব সংস্কার এসেছে সমাজের সবল-প্রভাবশালী মানুষের কাছ থেকে। সমাজে পুরুষের থেকে নারী দুর্বল। তাই তারা অবমূল্যায়িত, অবদমিত। নারী বা দুর্বলের জন্য এ সমাজ প্রতিবন্ধী। এই অন্ধ-বধির-প্রতিবন্ধী সমাজে মিথ্যা সংস্কারের সাহায্যে প্রভাবশালী অর্থাৎ সবলেরা দুর্বল মানুষকে নিজেদের আজ্ঞাবহ দাস করে রাখে। সভ্যতারও বিকাশ ঘটতে দেয় না। তাই যে সংস্কার মানবজীবন ও সভ্যতাকে আপন গতিতে এগিয়ে যেতে দেয় না তা সকলের বর্জন করা প্রয়োজন। কেউ শিক্ষিত হলেই যে সংস্কারমুক্ত হবে তা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সবসময় সংস্কারমুক্ত করে না। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন প্রকৃতির কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করা। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর।

একটি সংসারে শুধু নারীই থাকে না, থাকে পুরুষও। আর পুরুষকে ধারণ থেকে পালন সব নারীরাই করে থাকেন। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সংস্কার বিষয়ে নারী যদি সচেতন না হন, তবে তাদের মনের এসব বদ্ধমূল ধারণা অতি সূক্ষ্মভাবে সন্তানসন্ততি ও আশপাশের নারী-পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে নারীরই ছায়ায়। বাড়ির পুরুষেরা (বাবা, দাদা) শিশুদের যথেষ্ট সময় দেন না বা দিতে পারেন না। সেজন্য শিশু বয়সে দাদি-নানির কাছে গল্প, প্রবাদ-প্রবচন শুনে শুনে বড়ো হয়ে তারা হয় নারী ও পুরুষ। এজন্যই নারীকে ঘিরে থাকা কুসংস্কার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

যে সংসারে নারী নির্যাতন বেশি, যেখানে নারীর স্বাধীন মতামত দেওয়ার অধিকার থাকে না, যেখানে নারী (বিশেষ করে মা) অবমূল্যায়িত ও অবদমিত হন, সে সংসারের শিশুরা সাধারণত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও উগ্র হয়। তাই শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই কুসংস্কার দূর হবে না। এজন্য প্রয়োজন হয় বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ও সচেতনতা। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ও সচেতনতা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই জরুরি। আরো জরুরি নারীর প্রতি সমাজ-সংসার-রাষ্ট্রের সম্মানবোধ।

আফরোজা অদিতি লেখক। afrozaaditi1953@gmail.com

তথ্য সহায়তা

- আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র
- সংস্কার নয় কুসংস্কার, বিজ্ঞান চেতনা পত্রিকা